পরিচ্ছেদ আট

মুঘল শহর

কী কী কারণে মুঘলদের সময়ে শহর গড়ে উঠেছিল এবং কেন তার মধ্যে কয়েকটির পতন হয় এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এটুকু বলা যায় যে মুঘল যুগে নগরায়ণের ধারা হঠাৎ আসেনি বা সবগুলি শহর রাজানুগ্রহেও হয়নি। এর ধারা সুলতানি যুগ থেকেই চলেছিল যার বিকাশ ঘটে মুঘল যুগে, বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীতে যাকে মুঘল রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। অবশ্য যথার্থ ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রত্নতত্ত্বের কাজের অভাবে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা শক্ত। রাজনৈতিক শান্তি ও একই ধরনের শাসনব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে মুঘল যুগে নগরায়ণের প্রসার হয়েছিল বলে ধরা যায়। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল যদিও তার সংখ্যাতত্ত্ব বিরল। আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* থেকে খাজানা হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে মুঘল ভারতের জনসংখ্যা ছিল চোদ্দ থেকে পনেরো কোটির মধ্যে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এটি কুড়ি কোটিতে দাঁড়িয়ে যায়। বার্ষিক জনসংখ্যা বাড়ে শতকরা ০.১৪ ভাগ হিসাবে।

ঐতিহাসিকরা ত্রয়োদশ শতকের গোড়া থেকে ভারত ভূখণ্ডে নতুন শহর তৈরি হবার কথা বলেছেন যার অনেকগুলির পিছনে ছিল রাজানুগ্রহ ও পারিষদবর্গের উৎসাহ। এটাও অবশ্য দেখা যায় যে সুলতানদের ক্ষমতা যখন কমে আসছে তখন কতকগুলি শহরের উত্থান শুরু হয়েছে যদিও কোনো শহরই গড়ে পঁচাত্তর বছরের বেশি টেকেনি। কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে প্রাদেশিক শক্তির যে উত্থান হয়, তার শক্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। এটি সব থেকে পরিষ্কার দেখা যায় মান্ডু শহরের উত্থানের মধ্য দিয়ে। ১৪০১ সালে দিলওয়ার খান মোরি মান্ডু শহর শুরু করলে পরবর্তী রাজা হোসাঙ শাহ ওখানে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। ১৪০০ সালে বাহমনির রাজা তাজউদ্দিন ফিরোজ ভীমা নদীর উপর ফিরোজাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেন যা পঞ্চাশ বছর পরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। গুজরাটের সুলতান মুহম্মদ বেগারা আহমদাবাদের পঁচিশ মাইল দূরে মুহাম্মদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করলেও বরোদা থেকে কিছু দূরে চম্পানীর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে বিজয়নগর বহুদিন ধরে তৈরি হবার কথা জানা যায়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটি মধ্যগগনে পৌঁছায়। ঐ সময়ে বিভিন্ন শহরের গড়ে ওঠার

Scanned with CamScanner

তালিকা ঐতিহাসিক নাকভী দিয়েছেন। বাংলাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ভাগীরথীর পাড়ে যেসব বিভিন্ন ধরনের শহর গড়ে উঠেছিল, তার কোনোটা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিত্যক্ত হলেও অনেকগুলি পরবর্তী শতাব্দীতে বাড়তে থাকে। এই সব শহরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা পাওয়া যায়, যে ধরনের যোগাযোগ শহরের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। এসব শহরে যেসব ধর্মমতের জোয়ার এসেছিল সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বা মুসলমান ধর্মমত নয়। এই সব ধর্মমতের অধিকাংশ প্রবক্তা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ। এসব থেকে বলা যায় যে সুলতানি যুগের নগরায়ণের ধারা—উৎপাদন, বাজার ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ মুঘল যুগেও চলেছিল। মুঘল শক্তির উৎসাহে ও অন্যান্য কারণে নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে যার মধ্যে সুলতানি যুগের নগরায়ণের ধারা দেখা যায়। সুতরাং মুঘল যুগে নগরায়ণের প্রবহমানতা ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুঘল যুগের শহরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ফরাসি বণিক মার্তাঁ স্থলপথে সুরাট থেকে মসুলিপত্তনম গিয়েছিলেন। পথে তিনি যেসব শহর দেখেছেন তার একটা বিভাজন করেছেন যার সঙ্গে বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের বিভাজন মেলে না। মার্তাঁ বলেছেন বড় ও ছোট শহর, পাঁচিল দেওয়া ও পাঁচিল ছাড়া শহর, বাজার শহর, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাজার শহর ইত্যাদি। সম্ভবত শহরকে চোখে দেখে উনি এই বিভাজন করেছেন, অন্তত জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয়, কারণ কোনো শহরের জনসংখ্যার উল্লেখ তিনি করেননি। এটা হতে পারে যে শহরের চরিত্র, যা তার কার্যকলাপের মধ্যে দেখা যায় তার উপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করেছেন।

মধ্যযুগে প্রতিটি শহরের একটা বা একাধিক অর্থনৈতিক কাজ ছিল যা কখনও কখনও বদলে যেতে পারে। তবে শহরগুলি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত নয়, তার সঙ্গে আশেপাশের গ্রামের কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক আছে। ফলে গ্রামের উৎপাদন শহরে আসছে বিক্রি হতে এবং আসার সময় শুল্ক দিতে হয়। এই পণ্য বিক্রির অর্থ গ্রামে চলে যায় এবং আবার শহরে ফিরে আসে খাজানা হিসাবে। এই জন্যই ইরফান হাবিব মধ্যযুগের ভারতীয় শহরকে পরগাছা বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য এটা মানেননি, কারণ তাঁদের মতে শহরের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অঞ্চলের উন্নতি হয়। শহরে বেশি দামে বাজারী পণ্য বিক্রি করে উৎপাদক কৃষক যে আয় বেশি করেছিল এতে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন সূত্র ধরে ঐতিহাসিকরা বলছেন যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই মুঘল শহর তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করে। কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে মুঘল যুগে

শহরাঞ্চল জায়গা বদল করেছে। সুলতানি যুগে দেখা যায় যে প্রথম দিক থেকেই যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী জায়গা ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের অঞ্চলগুলির উন্নতি হচ্ছে। মুঘল যুগে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উন্নতি অব্যাহত থাকে। সপ্তদশ শতক থেকে উত্তর প্রদেশের একটা অংশে শহর তৈরি হতে থাকে। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জৌনপুর অবসন্ন হয়ে পড়লে নবাবদের উৎসাহে প্রথমে ফৈজাবাদ ও পরে লখনৌ বড় শহর হয়ে দাঁড়ায়। একই অঞ্চলের মধ্যে একটা শহরের পতনের পর ঐ অঞ্চলে আর একটা শহরের উদ্ভব ও উন্নতি কিছু নতুন নয়। অষ্টাদশ শতক থেকে সুরাট ও খাম্বাজের অবস্থা খারাপ হলে বোম্বাই, পুণা ও বরোদা উঠে আসে। প্রথমটি ইংরেজদের প্রশ্রয়ে এবং পরের দুটি মারাঠাদের ছত্রছায়ায়। সপ্তগ্রামের পতনের পর উড়িষ্যার উপকূলে হিজলি বন্দর কিছুকাল বৈদেশিক বাণিজ্য চালালেও সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে হুগলীর উত্থান শুরু হয়ে যায়। নানান কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কলকাতা হুগলীর জায়গা নিয়ে নেয়। অবশ্য বন্দরের উত্থান-পতনের কারণ আর সাধারণ শহরের উত্থান-পতনের কারণ একরকম নয়। সুরাটের পতনের পিছনে ছিল তার বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমির বিচ্ছিন্নতা যা তৈরি হয়েছিল মুঘল মারাঠা যুদ্ধের ফলে ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়া। এর সঙ্গে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির ওলন্দাজদের হাতে চলে যাওয়া, যার ফলে ঐদিকে সুরাটের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুরাটের সামনে ইউরোপীয় জলদস্যুদের ক্রমাগত হামলা ও মারাঠাদের সুরাট আক্রমণ এই পতনকে ত্বরান্বিত করে। খাম্বাজের অবস্থাও পড়তে থাকে, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এর নিজের বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়ে এলেও সুরাটের ইংরেজ বাণিজ্যকে পণ্য সরবরাহ করে চলছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার দেখা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর মারাঠারা গুজরাট দখল করলে তারা কয়েকটা বন্দরের ও প্রধান উৎপাদক কেন্দ্রগুলির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকে। সুতরাং মারাঠাদের আক্রমণে যে সুরাট ও খাম্বাজের অবস্থা খারাপ হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে তার সবটা মানা যায় না। মারাঠারা গুজরাট দখল করার পর যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল এই বন্দরগুলির পশ্চাদভূমিতে ইংরেজরা তার সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। সুতরাং বলা যায় যে বন্দর-শহরের পতনের পিছনে জটিল কারণ রয়েছে যা শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণ দিয়ে ধরা যায় না। অন্য দিকে উত্তর ভারতের শহরগুলির পতন ও নতুন শহরের উত্থানের মধ্যে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও প্রাদেশিক শক্তির বিকাশ অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধ্যবর্তী শহরগুলি অনেক বেশি অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকে। কেবল অযোধ্যাকেই এর ব্যতিক্রম বলে ধরা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা ও বিহারে হুগলি, মুর্শিদাবাদ ও

Scanned with CamScanner

পাটনার উদ্ভব ও উন্নতি হলেও, ১৭৫৭ সালের পর থেকে প্রথম দুটির পতন শুরু হয়ে যায়। এর পিছনে অবশ্য ইংরেজদের সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্ষমতালাভ বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শহরগুলি মুঘলদের শাসনক্ষেত্র হতে থাকে। ছোট বাজার-শহর বা ফার্সী দলিলে যেগুলিকে *কসবা* বলা হচ্ছে সেগুলি অবশ্য এই কেন্দ্র ছিল না। *সরকার* শহরের প্রধান ছিলেন ফৌজদার ও সাধারণ শহরের দেখাশোনা করতেন কোতোয়াল যিনি শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটাও দেখতেন। সমকালীন বিদেশী পর্যটক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বলছেন যে মুঘলদের শহরে ইউরোপীয় ধাঁচে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপালিটির মত সংস্থা ছিল না। কিন্তু দেখা যায় যে মুঘল শহরগুলিতে কোতোয়াল এই কাজটি করছেন। তাঁর অধীনে *মহতাসীব* নামে যে কর্মচারীরা ছিলেন তাঁরা এই কাজগুলি দেখতেন। শহরের ভাঙা পাঁচিল মেরামত করানো, জুয়া খেলা বন্ধ করা, পথঘাট পরিষ্কার রাখা, জীর্ণ বাড়ি পরিদর্শন করে ব্যবস্থা নেওয়া, মদ্যপান বন্ধ করা ইত্যাদি কাজ তাঁরা করতেন যেগুলি সমকালীন ইউরোপীয় শহরে কোনো সংস্থা করত। আওরঙ্গজেবের সময়ে *মহাতাসীবদের* ধর্মীয় রং লাগানোর ফলে তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও এদের দেখা মেলে। খাম্বাজে ঐ সময়ে *মহাতাসীব* ছিলেন যার উল্লেখ সমকালীন ইংরেজদের কাগজপত্রে পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান শহর যেমন কায়রো, বাগদাদ ইত্যাদির সঙ্গে মুঘল শহরগুলির কিছু মিল ও অমিল দেখা যায়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর, ভিতরে মসজিদ, মাদ্রাসা, হাম্মাম, সিংহদরজা, চারপাশে কৃষিসম্পদের বলয়, প্রশস্ত রাজপথ ও প্রাসাদ ইত্যাদিতে মিল রয়েছে। কারও কারও মতে মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলিত উলেমাদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল যেটা মুঘল শহরে ঐভাবে চোখে পড়ে না। সম্ভবত একই ধরনের গঠন বিন্যাসের ফলে কোনো কোনো মুঘল শহরকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর কোনো কোনো ইউরোপীয় পর্যটক 'মুর শহর' বলে অভিহিত করেছেন। বড় মুঘল শহর ছিল বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত ও কোনো কোনো শহরে প্রতিটি মহল্লায় দরজা ছিল যেগুলি শহরের দরজার মত সূর্যাস্তের সঙ্গে বন্ধ করা হত ও সূর্যোদয়ে খোলা হত। মুঘল অভিজাতরা প্রধানত রাজধানী শহরে থাকলেও তাঁদের বাড়ি ছিল প্রাসাদের অনুকরণে করা। বিশাল বাগানের মধ্যে ইঁটের বাড়ি। দরজা পেরোলে উঠান ও তার পরে দেওয়ানখানা বা বসার ঘর। এর পরে আবার উঠান ও তারপরে অন্দরমহল বা জেনানা মহল। বাড়ির বাইরে বাগানের পাশে ভৃত্যদের থাকার জায়গা। কোনো কোনো অভিজাতের বিশাল বাগানের মধ্যে বাড়ি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি পণ্ডিত আঙ্কতিল দ্যু পেরঁ মুর্শিদাবাদের বাইরে অভিজাত ইয়ার লতিফ খানের

বাড়িতে গিয়েছিলেন। এটি এত বিশাল বাগানের মধ্যে ছিল যে এই বাগানে চারশো লোক বাস করতে পারে। বলা দরকার যে বাংলা বা গুজরাটের স্থাপত্য উত্তরভারতের মত নয়। শাহ সুজা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজমহলে যে প্রাসাদ করেছিলেন সেটি পাথরের স্তম্ভের উপরে কাঠ দিয়ে করা যার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাড়ির মিল আছে। পরবর্তীকালে আগুনে এই প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে যায়। এটুকু বলা যায় যে বাংলার প্রাসাদগুলিও উত্তরভারতের অনুকরণে করা। সাধারণত শহরের একপ্রান্তে নদীর ধারে প্রাসাদ করা হত। সামনে থাকত বিরাট চক বা ময়দান যেখানে বণিকরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসত। একটি চওড়া রাজপথ এখান থেকে শহরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে। একে জড়িয়ে আছে অসংখ্য আঁকাবাঁকা গলি। রাস্তার দুপাশেই থাকত দোকান। এই চেহারা অবশ্য সুলতানি যুগের গৌড় (বাংলার রাজধানী) শহরেও ষোড়শ শতকের প্রথমে দেখা যায়। অবশ্য তুর্কি বা ইরানি প্রভাব উত্তর ভারতের প্রাসাদে যতটা দেখা যায় বাংলা বা গুজরাটে ততটা দেখা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকার লালবাগে তৈরি ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে এই ছাপ কিছুটা রয়ে গিয়েছে।

বড় বড় মুঘল শহরের পাঁচিলের বাইরে কারিগররা বাস করত। দিল্লির কারখানার প্রসঙ্গে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বলেছেন যে সূর্য ওঠার পর কারিগররা আসত ও সূর্য ডোবার আগেই চলে যেত। অর্থাৎ শহরের দরজা খুললে আসত এবং দরজা বন্ধ হবার আগে চলে যেত। এর ফলে বড় বড় শহরের শহরতলি বাড়তে থাকে। সুরাট ও খাম্বাজে একই অবস্থা হয়েছিল। সুরাটের শহরতলি এত বিশাল হয়ে যায় যে শহরতলি ঘিরে আর একটা পাঁচিল দিতে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে। মারাঠারা আক্রমণ করলে আশেপাশের গ্রামবাসী তাদের গরুবাছুর ও পরিবার নিয়ে ও শহরতলির পাঁচিলের বাইরের কারিগররা শহরের মধ্যে চলে আসতে থাকে, যদিও এটা ছিল সাময়িক। বার্নিয়ার অবশ্য এক জায়গায় বলেছেন যে গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা অত্যাচারিত হয়ে শহরে আশ্রয় নিচ্ছে। এটা ঐ সময়ে কতটা মানা যায় ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমরা অন্যদিকে দেখছি যে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি হচ্ছে যার ফলে শহরগুলিও বাড়ছে। পাঁচিলের বাইরে মারাঠাদের আক্রমণ সত্ত্বেও সুরাটের গ্রামাঞ্চলে যে অশান্তি ছিল এ রকম মনে করার কারণ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে সুরাটের বণিকরা শহরের বাইরে নিজেদের বাগানবাড়ি তৈরি করে সপ্তাহান্তে বিশ্রামের জন্য যাচ্ছে এটা সমকালীন ফরাসি কাগজপত্রে পাওয়া যায়। সুরাটের দ্রুত বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির পিছনে যে গ্রামাঞ্চলের বাড়তি উৎপাদন ছিল এটা মানতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য তখনও সম্ভবত তারা বিশাল পশ্চাদভূমি, যা দিল্লি ও আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত, নষ্ট হয়ে যায়নি। শহরগুলির বাড়ার পিছনে কারিগরী

Scanned with CamScanner

উৎপাদন ও বাজারের প্রভাব ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফরাসি পর্যটক মোদাভ আগ্রা শহরে অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। দিল্লিতে পাকাপাকিভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠার ফলে রাজদরবার ও অভিজাতরা চলে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মোদাভ বলছেন। উল্লেখযোগ্য যে মুঘল শক্তির অবক্ষয় ও ইংরেজ শক্তির উত্থানের কথা বললেও মোদাভ আগ্রা শহরের অবক্ষয়ের জন্য ঐসব কারণ দেননি।

বিদেশী পর্যটকরা লক্ষ্য করেছেন যে শহরে অভিজাতদের প্রাসাদোপম বাড়ি ও তার পাশাপাশি অসংখ্য খড়ের ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর যেখানে গরিব লোকেরা বাস করে। এগুলির দেওয়াল মাটির ও বাঁশ দিয়ে ঘেরা। বাসার মধ্যে কোনো আসবাব নেই, তৈজসপত্র মাটির। ধাতুর পাত্র বিরল, কারণ মুঘল ভারতে ধাতুর দাম খুব চড়া যা সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে ছিল। খাদ্যও ছিল দিনের শেষে একবার। কোনো কোনো পর্যটক অবশ্য বলেছেন যে দিল্লির সাধারণ মানুষ ঘি খেত। এত বিশাল সংখ্যায় পর্ণকুটির থাকার সমস্যা ছিল যে আগুন লাগার ভয় ছিল। বার্নিয়ার বলেছেন যে দিল্লিতে এরকম ভাবে আগুন লেগেছিল দুবার ও বহু কুটির পুড়ে বহু লোক মারা যায়। অবশ্য বড় লোকদের বাড়ি ছিল ইঁট ও পাথরের এবং কোনো কোনো বাড়ি চারতলা উঁচু ছিল যে ধরনের ছবি সুরাটেও পাওয়া যায়। পর্যটকরা বড় লোকদের বাড়িতে প্রচুর দরজা, জানালা রয়েছে বলে সমালোচনা করলেও, বার্নিয়ার বলেছেন যে গরমের দেশে ঐ ধরনের বাড়িই প্রশস্ত, কারণ বাতাস চলাচল করতে পারে। উনি গরমকালের রাতে ছাদে ঘুমাতেন। প্রায় সব বাড়ির মাটির তলায় একটা ঘর ছিল যেখানে খুব গরমের সময়ে লোকেরা আশ্রয় নিত। এগুলি ছিল সুসজ্জিত ঘর এবং বলা হত *তেহখানা*।

মুঘল যুগে দিল্লির শহরের বিন্যাস সম্পর্কে প্রয়াত সৈয়দ নুরুল হাসান একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। উনি বলেছেন যে সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে অভিজাতদের প্রচেষ্টায় এ শহর গড়ে উঠেছে এবং অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে মুঘল সামন্ত প্রভুদের অবক্ষয় হলে দিল্লি শহরেরও অবক্ষয় শুরু হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যা শহরে শুরু হয়েছিল সেটা ইংরেজদের আসার ফলে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শহরের নিজস্ব কাঠামো-রীতি আছে। দিল্লি শহরের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ রয়েছে। উনি দেখাচ্ছেন যে মুঘল ভারতে অন্যান্য শহরের কাঠামোর মত দিল্লিতেও গরিব ও বড়লোকদের বাসস্থানের জায়গার তফাত ছিল না। বাসস্থানের এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক এলাকারও তফাত নেই। সাধারণত একই জাতের লোকেরা এক জায়গায় বাস করত এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যাতায়াত ছিল। নানান উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দিত। বসন্ত পঞ্চমীতে

মুসলমানরা যেমন যোগ দিত, নাসিরুদ্দিন-চিরাগ-ই দিল্লি উৎসবে তেমনি হিন্দুরাও যোগ দিত।

শাহজাহানাবাদ শহর গড়ে ওঠে দুর্গ ও জামা মসজিদকে কেন্দ্র করে। দুর্গের বিপরীত দিকে চাঁদনি চককে শহরের কেন্দ্রস্থল বা বাণিজ্যিক এলাকা বলে ধরে নেওয়া যায়। ছোট রাস্তাকে বলা হত *কুচা*, যেমন *কুচাই বুলাকি বেগম*। পরবর্তীকালে এগুলিকে গলি বলা হতে থাকে। এলাকাকে বলা হত *মহল্লা*। অনেক সময়ে কারিগরদের কাজের ভিত্তিতে এলাকার নামকরণ হত (যেমন *মহল্লা ধোবিওয়ালা*)। প্রায় সব মহল্লার মধ্যে বাজার ছিল। সব থেকে বড় বাজারকে বলা হত *চক*। কোনো কোনো বড় অভিজাতের বাড়ির কাছের বাজারকে ঐ অভিজাতের নামের সঙ্গে চক জুড়ে দিয়ে বোঝানো হত। সাধারণত বড় পথের দুপাশে ছিল সারিবদ্ধ দোকান। দোকানের পিছনে বা দোকানের উপরে মাল রাখার জায়গা ও বণিকদের থাকার জায়গা ছিল। বাজারের নামকরণ অনেক সময়ে কারিগরদের পেশার ভিত্তিতে করা হত (যেমন জহুরি বাজার)। এছাড়া ছিল পাইকারি বাজার যেগুলি *গঞ্জ* নামে পরিচিত ছিল (যেমন দরিয়াগঞ্জ)। বড় পাইকারি বাজারকে বলা হত *মন্ডি* (যেমন সবজিমন্ডি)। বাজারের একটা অংশে ছাউনি ছিল, যাকে বলা হত *ছাট্টা*, এখানে কারিগররা বসে কাজ করত ও বাস করত। চতুষ্কোণ বাজারকে বলা হত *কাটারা*। যে ধরনের পণ্য বিক্রি হত তার জন্য এর নামকরণ হত (যেমন কাটারা নীল)।

প্রথমে যিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন তাঁর নামের ভিত্তিতে এলাকার নামকরণ করা হয়। এই বাড়িগুলি ছিল অভিজাতদের এবং বলা হত *হাভেলি*, যার সঙ্গে বসতবাড়ি ছাড়াও সংলগ্ন বাড়ি ও জায়গা বোঝায়। *হাভেলি আজম খান* ছিল এই ধরনের মহল্লার নামকরণ। তবে এর ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। অভিজাতদের বাড়িগুলি প্রায় একই ধরনের। বাইরের দরজার উপরে দোতলায় কতকগুলি ঘর ছিল, যাকে বলা হত *দেউড়ি*। এরপরে ছিল উঠান (*সাহন*) ও তারপরে *দেওয়ানখানা* বা কাজের ও বসার ঘর। এরপর *মহলসরা* বা থাকার জায়গা। দোতলাকে বলা হত *বালাখানা*। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে গোয়ালিয়রে দোতলা-তিনতলার বাড়ির কথা বলেছেন। দিল্লিতে সফদরজং-এর বাড়ির অনেকখানিই অটুট আছে।

দিল্লি ছাড়া এ ধরনের বাড়ির কথা উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গায় পাওয়া যায়। গোলকুন্ডাতেও এই ধরনের বাড়ি ছিল। সমকালীন ইউরোপীয় চিত্র থেকে সুরাটে এই ধরনের উঁচু বাড়ির ছবি দেখা যায়। অনেক বাড়ির ছাদ সমতল যেখানে পরিবারের মহিলারা বাগান করতেন। ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির জানালার রোদ আসার জন্য কাঁচ বা কুমিরের চামড়া বা আঁশ লাগানো হত। হিন্দু ও জৈন ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির ভিতরে বাগান ও মন্দির ছিল।

Scanned with CamScanner

১৬৫০ সালের পর শাহজাহানাবাদে পাঁচিল দেওয়া হয়। কিন্তু পরপর কয়েক বছরের বৃষ্টিতে ঐ পাঁচিল ভেঙে গেলে ১৬৫৮ সালের মধ্যে পাথর দিয়ে চারমাইল লম্বা, সাতাশ ফুট উঁচু ও বারো ফুট ঘন পাঁচিল দেওয়া হয়। এর সাতাশটি উঁচু বুরুজ বা মিনার ছিল ও বহু দরওয়াজা ছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্টিফেন ব্লেক গবেষণা করে দেখাচ্ছেন যে শাহজাহানাবাদ তৈরি হয়েছিল হিন্দু শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী। মানচিত্র তৈরি করে উনি দেখাচ্ছেন যে হিন্দু করমুকর অনুযায়ী শহরটি তৈরি করা হয়েছিল। উত্তর-দক্ষিণ পথ আকবরবাদী ও কাশ্মীরি দরওয়াজার সংযোগ করে ধনুকের ছিলার মত রয়েছে। দক্ষিণ থেকে পুবের পথ তুর্কমান দরওয়াজার সঙ্গে আজমিরি ও লাহোরি দরওয়াজার সংযোগ ঘটিয়ে ধনুকের বাঁকা অংশের চেহারা নিয়েছে। এই দুটি প্রধান পথ মিলিত হয়েছে দুর্গ, চাঁদনি চক ও ফৈজ বাজারে। ধনুকের ছিলার মত শহরের চেহারা সুরাট শহরেও দেখা যায় যেটি গড়ে উঠেছিল ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক কারণে।

শহর যমুনার উপর থাকায় জলের অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু শাহজাহান আটাত্তর মাইল দূর থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া ও পঁচিশ ফুট গভীর খাল কেটে নিয়ে এসেছিলেন যাকে বলা হত *নহর-ই-বিহিস্ত*। এটি কাবুলি দরওয়াজা দিয়ে শহরে ঢুকেছিল। এর একটি অংশ চাঁদনি চক ও দুর্গের মধ্যের পথ ধরে ফৈজ বাজারে পড়েছিল। অন্য অংশটি জাহানারা বেগমের বাগানের দিকে ভিতরে ঢুকে উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে শাহবুর্জে প্রাসাদের মধ্যে যায়। পূর্বদিকের মারবেল পাথরের নালি দিয়ে এই জল *মহলসরা* ঘুরে বাগানে পড়েছিল। এই বাগানটি ছিল *মহলসরা* ও আম দরবারের মাঝে। এই বাগানের মধ্যে দিয়েই সম্রাট হেঁটে দরবারের পিছন দিকের ছোট একটা দরজা দিয়ে দরবারে যেতেন।

বড় বড় অভিজাতরা, ধনী বণিক ও রাজপরিবারের সদস্যরা নিজ ব্যয়ে সরাইখানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সরাইগুলি ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত। ঘরের শ্রেণী বিভাগ ছিল—বড় ঘরের জন্য টাকা বেশি দিতে হত। চারপাশে ঘর সারি দিয়ে করা, মাঝখানে ছিল বাগান ও কাটারা। বড় বড় সরাই-এর ভিতর দর্জি, ধোপা, নাপিত, গায়ক ও নর্তকী পর্যন্ত থাকত। চাঁদনি চকে ফতেপুরি বেগম এই ধরনের একটা বড় সরাই করে দেন। জাহানারার বাগানে ঢোকার মুখে জাহানারা একটা বড় সরাই করেছেন যাকে পর্যটক বার্নিয়ার প্রধান দ্রষ্টব্য বলে উল্লেখ করেছেন। দোতলা এই সরাইটিতে নব্বইটি ঘর ছিল এবং প্রতিটি ঘরই ছিল চিত্রবিচিত্র করা। ধনী পারসিক ও উজবেগ বণিকরা এই সরাইতে থাকতেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির বিপরীত

দিকে ছিল *আরব-কি-সরাই* যার ভিতরের ছাদে যিশু ও মেরির চিত্র অঙ্কিত ছিল ও যার অস্পষ্ট অংশ এখনো দেখা যায়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়ে উঁচু টিলার ওপর থেকে ইংরেজদের কামানের গোলাবর্ষণের ফলে দিল্লি শহরের অনেক সৌধ ভেঙে যায়। দিল্লি দখল করার পর উন্মত্ত ইংরেজ ও শিখ সৈন্যরা প্রাসাদ লুঠ করে ও বহু সৌধ ভেঙে ফেলে। তবুও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে দিল্লি শহরের পাঁচিলের মধ্যে ৪১০টি সৌধ রয়েছে যার মধ্যে ৩৭৮টি ছিল দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে। এর মধ্যে ২০২টি হচ্ছে মসজিদ যেগুলি ১৬০৯ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। ব্লেক মনে করছেন যে ১৬৩৯ সাল থেকে ১৭৩৯ সালের মধ্যে একশোটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। ভারতের সব থেকে বড় জামা মসজিদ ছোট একটা টিলার উপরে তৈরি হয়। এর ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা হয় ৬ অক্টোবর ১৬৫০ সালে।

শাহজাহানের সময়কার দিল্লির বাড়িগুলিকে নুরুল হাসান কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছেন। এই বিভিন্ন ধরনের বাড়ি অন্যান্য বড় বড় শহরেও দেখা যায়। সাধারণ বাড়িকে তিনি বলেছেন *মকান*। বড় বাড়িকে বলা হত *মঞ্জিল* যে শব্দটি পরবর্তীকালে উর্দুতেও চলে এসেছিল। জাহানারা বেগমের বাড়িকে বলা হত *মঞ্জিল জাহানারা বেগম*। *কোঠি* বলতে ছোট বাড়িকে বোঝায় যেখানে শিল্পকাজ বা কারখানার কাজকর্ম হত। ঐ অর্থে উপকূলে বিদেশী কোম্পানিদের বাড়িকে *কোঠি* বলা যায় যদিও সপ্তদশ শতকের ঢাকায় তাদের বাড়িগুলি ছিল বেশ বড়। *বাংলা* বলতে বোঝাত আলাদা বাড়ি। ইংরেজরা এর বহুল প্রচার করেছে পরবর্তী শতাব্দীতে। *হাভেলি* কথাটি নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। স্টিফেন ব্লেক কয়েকটি *হাভেলির* কথা বলেছেন যার মধ্যে কামার-আল-দিনের হাভেলি উল্লেখযোগ্য। সমকালীনদের চোখে ঐ ধরনের *হাভেলি* এত বড় ছিল যে মুহম্মদ সালি বলেছেন যে এরকম একটা *হাভেলির* উঠানে সারা শহর খালি করে দেওয়া যায়। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ'র দিল্লি আক্রমণ ও লুঠ করার আগে দিল্লি শহর কতটা জনসমাগম ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল তার বাণিজ্যিক পসরা ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে সে কথা সমকালীন ফার্সী বই *মুরাক্কা-ই দেহলী*-তে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুঘলরা সাধারণত পুরনো শাসনকেন্দ্রগুলিই ব্যবহার করেছে ও এগুলিই বিস্তার লাভ করেছে। এইসব শহরের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ রয়ে গিয়েছে। ফলে ওগুলি শুধু মুসলমানি শহর বলে ধরা ঠিক নয়। প্রায় সব শহরের মধ্যে কারিগরী শিল্প ও ব্যবসা গড়ে উঠেছিল, টাকাপয়সার লেনদেন ও আর্থিক যোগাযোগ মুঘল ভারতের সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণ ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পৌঁছেছিল যার মধ্যে হিন্দু ও জৈন মহাজন ও বণিকদের বড় অংশ ছিল। সুতরাং মুঘল শহর

Scanned with CamScanner

সাম্প্রদায়িক নয়। কোনো কোনো জায়গায় শহরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুও ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবাব শায়েস্ত খানের সময়ে মখসুদাবাদ-কাশিমবাজারের ফৌজদার ছিলেন বালচাঁদ। তিনিই ঐ শহরের কাজকর্ম, এমনকি বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত করতেন।

পুরনো কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করা ছাড়াও মুঘলরা নতুন শহর তৈরি করেছিল। আকবরের সময়ে ফতেপুর সিক্রি ও শাহজাহানের সময়ে শাহজাহানাবাদ তৈরিই তার প্রমাণ। উল্লেখযোগ্য যে মুঘলরা ছাড়াও অন্যান্য রাজবংশ নতুন শহর তৈরি করেছিল। ১৫৯১ সাল থেকে মুহম্মদ কুলি কুতুব শাহ গোলকুন্ডার পাশে *গিরিডন* ছকে হায়দ্রাবাদ শহর তৈরি করা শুরু করেন। বলা হয় যে গোলকুন্ডাতে জনসমাগম বেশি হওয়াতে এই নতুন শহর তৈরি করা শুরু হয়েছিল। মান্ডু শহর প্রতিষ্ঠার কথা আগেই বলা হয়েছে। গুজরাটে ফিরোজাবাদ তৈরিও উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া আহমেদাবাদ ও বরোদার কাছে চম্পানীর শহরও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এইসব শহর তৈরির পিছনে কী ধরনের আদর্শবাদ কাজ করছিল বলা শক্ত। শুধু লোক বাড়ার জন্য নতুন শহর তৈরি করা হয়েছিল বলে বলা হয়। ফতেপুর সিক্রি তৈরির পিছনে সম্ভবত ছিল তৈমুর বংশের সার্বভৌমতার প্রকাশ যেটি শাহজাহানাবাদ তৈরির পিছনেও ছিল বলে বলা যেতে পারে। সম্রাট যে জগদীশ্বরের ছায়া এটা সুলতানি যুগে থাকলেও শেষদিকে সেটা অদৃশ্য হতে থাকে। মুঘলরা সম্ভবত ইঁট-পাথরের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিলেন। এই নতুন শহরের মধ্যে ধর্মের ছোঁয়া দেখা যায় যদিও ধর্ম প্রধান হয়ে দাঁড়ায়নি। ফতেপুর সিক্রি তৈরির সময় শেখ সলিম চিস্তির ও অন্যান্য সন্তদের সঙ্গলাভের কথা পাওয়া যায়। শাহজাহানাবাদে এরকম কোনো স্পষ্ট ইশারা না থাকলেও কাছেই ছিল নিজামুদ্দিন আওলিয়ার সমাধি যেখানে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে ধরা দেবার আগে দিল্লির প্রাসাদ ছেড়ে গিয়েছিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলিতে ধর্ম যতটা প্রধান ছিল বলে বলা হয়, মুঘল ভারতের শহরগুলিতে, কয়েকটি তীর্থস্থান যেমন বারাণসী, মথুরা বা আজমীর ছাড়া সেরকম প্রভাব চোখে পড়ে না। আগেই দেখা হয়েছে যে মুঘল ভারতের শহরের ভিতরে ধর্মের প্রভাব কম, অন্তত মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলির মত নয়। উলেমা বা সুফিদের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু শহরের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব বিশেষ পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের শহরে *নগরশেঠ* থাকতেন যিনি শহরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতেন। আহমেদাবাদের নগরশেঠের কথা জানা যায়। এছাড়া বিভিন্ন শহরে কারিগরদের *গিল্ড* বা পঞ্চায়েত ছিল। তারা অবশ্য নিজেদের সদস্যদের সমস্যা মেটাত, কিন্তু সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা

করতেন। গুজরাটের খাম্বাজ শহরে পাথর কাটার কারিগরদের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে শহরের প্রধান কাজকর্ম দেখতেন কোতোয়াল। পর্যটক থেভনো বলেছেন যে সুরাট শহরে কোতোয়াল রাত্রে সৈন্য নিয়ে পথে টহলদারি করতেন। নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কাজ দেখতেন *মহতাসীব* যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়াও বন্দর শহরগুলিতে ও অন্যান্য বড় শহরে, রাজধানী ছাড়া, ছিলেন মুৎসুদ্দি যাঁর হাতে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল। সুরাট শহরে উনি ছিলেন, এছাড়া ছিলেন কিল্লাদার, যাঁর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুৎসুদ্দির প্রবল লড়াই হয়। খাম্বাজে মুৎসুদ্দি ও ফৌজদারের কথা পাওয়া যায়। মুৎসুদ্দি ছিলেন নবাব যিনি কিল্লার মধ্যে থাকতেন ও পরে স্বাধীন হয়ে যান।

ছোট শহর ছিল অনেক যেগুলিকে বাজার-শহর বলে অভিহিত করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জেসুইট পাদ্রিদের লেখা থেকে জানা যায় যে এগুলি চালাতেন জমিদাররা। অবশ্য তখন পালাবদলের যুগ ও তাঁরা ছিলেন আধা-স্বাধীন। পরবর্তীকালে মুঘলরা এই উপকূলবর্তী শহরগুলি দখল করলেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। আরাকানিদের আক্রমণের ফলে এলাকা ছারখার হয়ে যায় ও শহরগুলি আর বাড়েনি।

এর থেকে বড় শহর ছিল *সরকার*, যার উদাহরণ পাওয়া যায় মখসুদাবাদ-কাশিমবাজারের নিদর্শনে। মখসুদাবাদ ছিল *সরকার* এবং এর দেখাশোনা করতেন ফৌজদার। এর থেকে ছোট কিন্তু বাজার-শহরের থেকে বড় শহর ছিল নবদ্বীপ। এখানে প্রধান ছিলেন কোতোয়াল ও কাজি। কাজির সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক আমলাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। চৈতন্য যখন তাঁর দলবল নিয়ে শোভাযাত্রা করে কাজির বাড়ি আক্রমণ করেন, তখন কোতোয়াল কাজির সাহায্যে এগিয়ে আসেননি বা পরে কোন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেননি। অথচ এই ঘটনার আগে চৈতন্যের সঙ্গে কটকের লোকেদের বচসা হলে কোতোয়াল চৈতন্যকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সাধারণত শহরের মধ্যে দোকানে মাল কেনা ও বিক্রির ওপর কর ছাড়া আর কোনো কর ছিল না। বাড়ির উপরে করের কথাও জানা যায় না। তবে বড় বড় শহরে মাল ঢোকা ও বেরোনোর সময়ে কর দিতে হত। এই সব কর সংগ্রহ করতেন কোতোয়াল। বন্দরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কর ছিল যেগুলি সংগ্রহ করতেন শাহবন্দর। মাল আমদানি-রপ্তানির উপর কর ছিল। কোনো কোনো বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেললে কর দিতে হত। বন্দরের শুল্ক সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল প্রধানত প্রাদেশিক দেওয়ানের এবং তাদের নিজেদের কর্মচারী ছিল শুল্ক সংগ্রহ ও মালের মূল্যায়ন করার জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শহরের ভিতরের অবস্থা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। গুজরাটের বন্দর ও বাণিজ্য অবসন্ন হয়ে পড়লে শহরে কর বসানো শুরু হয়।

Scanned with CamScanner

খাম্বাজের নবাব বণিকদের জামা তৈরি করার উপর কর বসান অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। তার কিছুকাল পরে বাড়ির উপর কর বসানো হতে থাকে। শহরের ভিতরকার পথঘাটও সেরকমভাবে আর রক্ষা করা হয় না। সপ্তদশ শতকের আশীর দশকে বিদেশী পর্যটকরা সুরাট শহরের ভিতরে জল জমতে দেখেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কোলি ও অন্যান্য উপজাতিরা সুরাটে শহরের দরজা পর্যন্ত লুটপাট করতে থাকে।

কোতোয়ালের কাজ ছিল শহরের ভেতরকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এজন্য তিনি প্রচুর গুপ্তচর নিয়োগ করতেন যারা অনেক সময়ে বাড়িতে জমাদারের কাজ করত। শহরের প্রধান দরওয়াজার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের হাতে। মহল্লার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি প্রতিটি মহল্লায় একজন *মীর মহল্লা* নিয়োগ করতেন মহল্লার প্রাচীন ও বিশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্য থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শহরে বড় রকমের গোলমালের কথা পাওয়া যায় না। ১৬৮৪ সালে গুজরাটে মাতিয়া বিদ্রোহ শুরু হলে বিদ্রোহীরা কয়েক মাসের জন্য ভারুচ শহর দখল করে কাজিকে হেনস্তা করে। পরে মুঘল সৈন্য এসে এদের হটিয়ে দেয়। ঐ সময় থেকেই সুরাট শহরে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। বিদেশী বণিকদের বর্ণনায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। একদিকে মুৎসুদ্দিদের টাকা সংগ্রহ করার আপ্রাণ চেষ্টা ও অন্যদিকে সুরাটের সামনের সমুদ্রে জলদস্যুদের অত্যাচারে বণিক গোষ্ঠী বিপন্ন বোধ করতে থাকে। হজ থেকে ফেরা বিরাট মুঘল জাহাজ জলদস্যুদের কবলে পড়লে শহরের লোকেরা ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করে। কোতোয়াল ইংরেজদের বন্দী করে তাদের প্রাণ বাঁচান। অষ্টাদশ শতকের প্রথমে আহমেদাবাদে বণিক ও শরফদের *বাট্টা* নিয়ে গোলমাল বাধে। ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুরাটের কিল্লাদার ও মুৎসুদ্দির মধ্যে সাতদিন গুলিগোলার লড়াই চলেছিল যার মধ্যে বণিকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। শহরে এই ধরনের ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাড়লেও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরের রাজ্য গোলকুন্ডায় ঘটেছিল। ১৬৭০ সালে মসুলিপত্তনমে এক আর্মেনীয় বণিককে ধরা নিয়ে ফরাসি ও শহরের শাসনকর্তার রাস্তায় লড়াই হয় যেখানে এক ফরাসি মারা যায়। তবে সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শহরে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া যায় না।

ভারতীয় শহরের জনসংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতরা একেবারে একমত না হলেও তাদের মতামতের মধ্যে খুব বেশি ফারাক নেই। ইউরোপে লন্ডন ও প্যারিসের জনসংখ্যা ১৬০০ সাল নাগাদ দু'লক্ষের উপরে ছিল। অন্য মতে প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। এর তুলনায় ভারতের শহরগুলির জনসংখ্যা বেশি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্যটক নিকোলো কন্টি বিজয়নগর শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি

ছিল বলে ধরেছেন। বর্তমানের একটা হিসাবে দেখা যায় যে জনসংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি ছিল। পাদ্রি জেভিয়ার বলেছেন যে সম্রাট যখন আগ্রায় ছিলেন তখন আগ্রার জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। ১৬৪০ সালে পাদ্রি মানরিক আগ্রার জনসংখ্যা ধরেছেন ছয় লক্ষ। এদের মধ্যে উনি বিদেশীদের ধরেননি। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় এক বিদেশী পর্যটক লাহোরকে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বলে ধরেছেন। ১৬৩১ সালে পাদ্রি মানরিক পাটনা ও ঢাকার জনসংখ্যা দু'লক্ষ বলে ধরেছেন। পাটনার সম্বন্ধে ঐ সময়ে এটি খাটে কিনা ভেবে দেখার বিষয়। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী ছিল এবং নবাব ও অভিজাতবর্গ ওখানে ছিলেন। পাটনার উত্থান শুরু হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাড়তে থাকে।

ভারতীয় শহরের এই বিশাল জনসংখ্যা ইরফান হাবিবের সাম্প্রতিক মতামতের কাছে যায়। এর আগে মোরল্যান্ড ও অর্থনীতিবিদ অশোক দেশাই-এর মতামত আলোচনা করে শিরিন মুসভি দেখাচ্ছেন যে ১৫৯৫-৯৬ সালে আকবরের সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে নয় কোটির উপরে (খান্দেশ ও বেরার বাদ দিয়ে)। এর মধ্যে শতকরা পনেরোভাগ শহরাঞ্চলে বাস করত। এটি করা হয়েছে আবুল ফজলের *আইন-ই আকবরী*-তে প্রদত্ত ভূমি-রাজস্বের ভিত্তিতে। কিন্তু এর মধ্যে সম্ভবত শহরের পাঁচিলের বাইরে শহরতলীতে যেসব কারিগর জমায়েত হয়েছিল ও যাদের কোনো জমি ছিল না ও ভূমিরাজস্বের প্রশ্নও ওঠে না, তারা ছিল না। এদের ধরলে শহরের জনসংখ্যা প্রায় আরও দেড় কোটি বাড়বে। এর ওপর ভিত্তি করে মুসভি দেখাচ্ছেন যে ষোড়শ শতকের শেষে আগ্রা শহর ছিল সব থেকে জনসমৃদ্ধ যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। একই প্রথা ব্যবহার করে ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যা ছিল দু'লক্ষ বিশ হাজার যখন সম্রাট ওখানে ছিলেন। করের ভিত্তিতে গুজরাটের আহমেদাবাদকে সবথেকে বেশি জনবহুল বলে বলা হয়। গুজরাটের কর থেকে আয় অনেক বেশি হত—মোট আয়ের প্রায় শতকরা উনিশ ভাগ। এর থেকে বলা যায় যে বাণিজ্যিক ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় ছিল যদি আমরা দেখি যে অন্যান্য সুবার তুলনায় গুজরাটের শহরাঞ্চলের আয় মোট জমার শতকরা পাঁচ ভাগের মত। মোরল্যান্ডের মতে অবশ্য লাহোর ছিল আগ্রা বা দিল্লির থেকে বড়। এই প্রথার অসুবিধা হল যে সব এলাকার পণ্যের কর এক রকম নয়, পণ্যের ধরনও আলাদা। কিন্তু যেহেতু ভূমি-রাজস্ব ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস, সুতরাং অন্যান্য সূত্র না থাকায় এই প্রথার হিসাব মেনে নেওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গৌড় শহরের পতনের মুখে ফরাসি পর্যটকের লেখা থেকে গৌড়ের জনসংখ্যার হিসাব ধরা হয়েছে দু'লক্ষ যেটা সমকালীন ফতেপুর সিক্রির জনসংখ্যার কাছে আসে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সপ্তগ্রাম বন্দরের জনসংখ্যা ধরা

Scanned with CamScanner

হয়েছে পঞ্চাশ হাজার। আবুল ফজলের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে সবা সামিউদ্দিন তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখাচ্ছেন যে গৌড় শহরের জমা বাংলার মধ্যে ছিল সবথেকে বেশি। এর তুলনায় পূর্ববাংলার যশোহরের জমা ছিল এক-চতুর্থাংশ ও সোনারগাঁও'র জমা ছিল যশোহরের জমার এক-চতুর্থাংশ। মনে রাখতে হবে যে আবুল ফজল যখন লিখছেন তার প্রায় বিশ বছর আগে গৌড় শহর পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আবুল ফজলের হিসাব আফগানদের শেষদিকের। তখন গৌড় শহরই আগ্রার বা ফতেপুর সিক্রির সমকক্ষ ছিল বলে বলা যায়। সুলতানি যুগের শেষদিকেও শহর বাড়ছিল যা মুঘলদের সময়ে চলতে থাকে।

ইংরেজ ঐতিহাসিক কিংসলে ডেভিস ১৬০০ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা সাড়ে বারো কোটির কাছে ধরেছেন। ওঁর হিসাব অনুযায়ী সমগ্র মুঘল যুগে জনসংখ্যা বাড়ছিল বছরে গড়ে ০.১৪ ভাগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই হিসাব অনুযায়ী সমগ্র জনসংখ্যার হার বাড়ছিল বছরে গড়ে ০.৩০ শতাংশ ভাগ। ইরফান হাবিবের হিসাব এর থেকে একটু অন্যরকম। উনি বলছেন ১৬০০ সাল নাগাদ মুঘল সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দ কোটি দু'লক্ষর মত। এর পনেরো শতাংশ শহরে বাস করত। ফলে শহরের জনসংখ্যার ওঁর হিসাব শিরিন মুসভির থেকে কিছুটা বেশি। কিন্তু হাবিব জনসংখ্যা বাড়ার হার ডেভিসের মত নিয়েছেন।

মোরল্যান্ড জনসংখ্যার হিসাব করতে একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আবুল ফজলের দেওয়া চাষযোগ্য জমির ভিত্তিতে উনি বলছেন যে মুলতান থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল তিন থেকে চার কোটি। এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের জনসংখ্যা যোগ করে উনি ভারত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ধরেছেন দশ কোটির কাছাকাছি। মোটামুটিভাবে মোরল্যান্ডের পদ্ধতি গ্রহণ করেই মুসভি, ডেভিস ও হাবিব অন্য অঙ্কে পৌঁছেছেন।

মোরল্যান্ডের পদ্ধতির কিছু গোলমাল আছে। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে তিনি চাষযোগ্য জমির খাজানাকে ভিত্তি করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যে উনি সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করেছেন। আগেই দেখানো হয়েছে যে ঐ সময়ের জনসংখ্যা (উত্তর ভারতে) অন্যান্যরা মোরল্যান্ডের থেকে অনেক বেশি ধরেছেন।

এছাড়াও মোরল্যান্ডের পদ্ধতির কিছু ত্রুটি দেখানো হয়েছে। মোরল্যান্ড উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে *আরাজি* বা জরিপ করা জমির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু *আরাজির* মধ্যে চাষযোগ্য জমি ছাড়াও পুকুর ও চাষযোগ্য অনাবাদি জমি রয়েছে। আওরঙ্গজেবের সময়ের একটা হিসাব থেকে দেখা যায় যে ওঁর সময়ে *আরাজি* জমি ষোড়শ শতকের তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে। কিন্তু তখনও প্রচুর অনাবাদি জমি

পড়ে আছে। এখন এটাই বলা হয় যে ১৯০০ সালের তুলনায় ১৬০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা প্রায় এক চতুর্থ-পঞ্চমাংশ কম ছিল। এর থেকে বলা সম্ভব যে ১৬০০ সাল নাগাদ চাষ যাট শতাংশ ১৯০০ সালের তুলনায় কম ছিল। এসব তথ্য বিবেচনা করে বলা যায় যে ১৬০০ সাল নাগাদ মুঘল ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় চোদ্দ কোটি দু'লক্ষ। অশোক দেশাই অন্য একটি পদ্ধতির সাহায্যে বলছেন যে আকবরের সাম্রাজ্যে জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি থেকে সাড়ে আট কোটির মধ্যে। শিরিন মুসভি এই পদ্ধতির নানান ত্রুটি বের করে বলছেন যে জনসংখ্যা দশ কোটির নীচে ছিল।

এই জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা পনেরো ভাগ শহরে বাস করত বলে ধরা হচ্ছে। চাষিরা তাদের উৎপাদনের অর্ধেক নিজেদের জীবনধারনের জন্য রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিত খাজানা মেটানোর দায়ে। বিক্রিত শস্য শহরের বাজারে আসত। জমিদাররা নিত শস্যের দশ থেকে পঁচিশ ভাগ। এরা থাকত গ্রামাঞ্চলে এবং এদের আয় থেকেই এরা সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন রাখত। বলা হচ্ছে যে জমিদারদের অধীনে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। সুতরাং বলা যায় যে, শাসকশ্রেণীর হাতে জমির খাজানার একটা বড় অংশ আসছিল। শহরে যে অংশটা আসত সেটা শতকরা একুশ ভাগের কম নয় এবং এর সবটাই শহরে খরচ হত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গে সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন ও খাজানার যোগ রয়েছে। এই হিসাব মেনে নিলে বলা যায় যে শহরের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা পনেরো ভাগের বেশি ছিল।

অন্য আরেক দিক থেকে হিসাব করলে আমরা শহরের জনসংখ্যার একটা হিসাব পাই। মুঘল যুগে গ্রামের সংখ্যা ইংরেজ যুগের থেকে বেশি ছিল বলে ধরা হয়। কিন্তু ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে মুঘল যুগের গ্রামের পরিধি ছোট ছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ে দাক্ষিণাত্য, বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদে গ্রামের সংখ্যা পাওয়া যায় ৪,৫৫,৬৯৮। আকবরের সময়ে নিজামুদ্দিন আহমদ লিখেছিলেন যে আকবরের সাম্রাজ্যে ১২০টা বড় শহর ও ৩২০০টা *কসবা* আছে। উনি আরো বলেছেন যে প্রতিটি শহরের সঙ্গেই একশো থেকে হাজারটা গ্রাম লাগানো রয়েছে। শহরের সঙ্গে কতটা জমি লাগানো আছে এবং তার কত খাজানা এটা আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরী*-তে দিয়েছেন। এর উপর হিসাব করে দেখা যায় যে আকবরের সময়ে শহরের জন-সংখ্যা এক কোটি সাত লক্ষের বেশি ছিল। নিজামুদ্দিনের শহরের সংখ্যার হিসাব মেনে নিলে বলা যায় যে আকবরের সময়ে গড়পড়তা প্রতি শহরে পাঁচ হাজার লোক ছিল। এ সংখ্যা অবশ্যই অবাস্তব বলে বোধ হয়। শুধু বলা যায় যে সাধারণ শহর ও বাজার-শহরে বেশি লোক ছিল না এবং ঐ ধরনের শহরের সংখ্যা এত বেশি যে গড়পড়তা লোকসংখ্যা অনেক কমে যায়।

Scanned with CamScanner

মুঘল যুগকে 'শহরের স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করতে কারুর দ্বিধা বোধ করার কথা নয়। এই শহরের সমৃদ্ধি, নগরোন্নয়নে বিস্তার ইত্যাদির পিছনে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘলদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা তৈরি করা যার ফলে কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে ও নগরায়ণ বিস্তার লাভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতের বড় একটা অংশে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতা ও তৈমুরের ভারত আক্রমণের ফলে নগরায়ণ বাড়তে পারেনি। প্রদেশগুলি স্বাধীন হয়ে পড়লে বিভিন্ন প্রদেশে নতুন শহর তৈরি শুরু হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুঘল যুগের সূচনা যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর নগরায়ণের মধ্য দিয়ে যেটি সমকালীন ইউরোপীয় শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। প্রাক-ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তির প্রসার ও কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবক্ষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফলে এই বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা আরেকটা ইতিহাস।

Scanned with CamScanner